মুস্তফা

নবী-জীবনের গল্পভাষ্য

মুস্তফা

নকীব মাহমুদ

নাশাত

নবী-জীবনের গল্পভাষ্য
মুস্তফা
নকীব মাহমুদ

প্রথমপ্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯
নাশাতসংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ইসলামি টাওয়ার
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

স্বত্ব : সংরক্ষিত

বানান : সালমান মোহাম্মদ
প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ
বিনিময় : ২৬৫ (দুইশ পঁয়ষট্টি) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-34-6302-9

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ

ডালিয়া আফরিন
প্রিয়তমা, এবং
আমাদের অনাগত সন্তান।
তুমি যখন পড়তে শিখবে তখন এই বই পড়ে পড়ে জানতে
পারবে আমাদের প্রিয়নবী কত বড়ো মানুষ ছিলেন!
এই বই তোমার জন্য।

কৈফিয়ত

আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া। তিনি তাঁর প্রিয় হাবিব দোজাহানের শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহর জীবনচরিত নিয়ে লেখার তাওফিক দান করেছেন। আমি মনে করি প্রত্যেক লেখকেরই মনের তামান্না থাকে প্রিয় নবীজিকে নিয়ে দু'কলম হলেও যেনো লিখতে পারে। কারণ, প্রিয়নবীকে নিয়ে লিখতে পারায় যে আনন্দ আর তৃপ্তি থাকে, পৃথিবীর আর কোনো বিষয় নিয়ে লিখলে এমন তৃপ্তি পাওয়া যায়; আমি জানি না। সেই যে প্রথম যেদিন কলম ধরতে শিখেছি, সেদিন থেকেই রাসুলুল্লাহর সিরাত লেখার স্বপ্ন পুষতাম বুকের ভেতর। সেই স্বপ্ন এখন পূরণ হতে চলেছে- আলহামদুলিল্লাহ!

বাজারে বাংলাভাষায় লেখা ছোটোদের উপযোগী সিরাতবিষয়ক বইয়ের পরিমাণ খুব বেশি নেই বললেই চলে। হাতেগোনা যা আছে, তার বেশিরভাগই একেবারে নিম্নমানের। অতি নিম্নমানের গদ্য, শব্দের অপব্যবহার আর দৃষ্টিকটু বাক্যগঠনে ভরা এসব সিরাতের বই পাঠকেই কেবল ব্যাহত করে। তবে ছোটোদের জন্য যে সিরাতের ভালো কোনো কাজ হয়নি, এ কথা একদমই মানতে নারাজ আমি। ভালো কোনো কাজ হয়নি শুধু এই দাবিই প্রত্যাখ্যান করছি না সেই সাথে সেসব গুণী লেখককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, যারা হৃদয়ের শব্দমালা সাজিয়ে ছোটোদের জন্য আমাদের প্রিয় নবীজির সিরাত লিখে গেছেন। সবার নাম এখানে উল্লেখ করার খুববেশি প্রয়োজন দেখছি না। তবে মুস্তফা প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে একজনের কথা না বললেই নয়— এয়াকুব আলী চৌধুরী। শিশুসাহিত্যিক এয়াকুব আলী চোধুরীকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই। মুস্তফা লেখার পেছনে এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূরনবী' বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। দোয়া করি আল্লাহ মরহুমকে জান্নাতবাসী করুক।

চেষ্টা করেছি মুস্তফার বর্ণনাভঙ্গি শিশুদের উপযোগী করে তুলতে। আশাকরি মুস্তফা হাতে নিয়ে শিশুরা হতাশ হবে না।

মুস্তফা প্রকাশের এই শুভক্ষণে কয়েকজনকে খুববেশি মনে পড়ছে। সাজ্জাদুর রহমান সাজু। ছোটোভাই সাজুর কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করব না। ভালোবাসায় বুকে জড়িয়ে নিলাম।

শ্রদ্ধেয় বড়োভাই, সাইফ সিরাজ। প্রচণ্ড ধৈর্যসহকারে মুস্তফার পাণ্ডুলিপি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন এবং পাঠপ্রতিক্রিয়া জানিয়ে যেভাবে আমাকে সাহস যুগিয়েছেন, তার এই ঋণ শোধ করার নয়। ভালোবাসা জানবেন বড়োভাই।

মাহদী হাসান মুর্তযা ভাই। মুস্তফা লেখার পুরো নয়টা মাসই মাহদী ভাইয়ের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আশাকরি, সামনের দিনগুলোতেও আপনাকে কাছে পাবো।

আবদুল্লাহ আশরাফ। আমিন আশরাফ। আপনাদের কাছেও কৃতজ্ঞ থাকব। দোয়া করি, আল্লাহ আপনাদের হায়াত দারাজ করুক। আর মনেপ্রাণে চাইব আপনাদের হাত দিয়ে আরও ভালো কোনো সিরাত আসুক।

আহসান ইলিয়াস ভাই। দারুল হিলাল-এর স্বত্বাধিকারী লেখক অনুবাদক আহসান ইলিয়াস ভাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। আহসান ভাই সাহস করে এগিয়ে না এলে এত দ্রুত আলোর মুখ দেখত না মুস্তফা। আল্লাহ আহসান ভাইকে উত্তম প্রতিদান দিক। আমিন।

সবশেষে পাঠক, বিশেষ করে শিশু-কিশোর বন্ধুরা, বইটি তোমাদের জন্য লেখা। তোমরা এখন পড়তে শিখেছ। দিনে রাতে কত কত বই যে পড় তোমরা! পড়তে ভারি আনন্দ লাগে, তাই না? তোমাদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিতে মুস্তফা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে। তা হলে আর দেরি কেনো? চলো মুস্তফার সঙ্গী হই!

—নকীব মাহমুদ
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
মমতালয়, পূর্ব রাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা।

একটি হাতি ও জাদুর পাখিরা - ১১
মা আমেনার কোলে হাসে পূর্ণিমারই চাঁদ - ১৭
শিশুনবী দোলনা দোলে মা হালিমার কোলে - ২২
মামার বাড়ি মধুর হাঁড়ি - ৩৪
মাকে ছেড়ে দাদুর কোলে - ৩৯
চাচার ঘরে নুর নবীজি - ৪৩
রক্তের নদী বয় মক্কার আকাশে - ৫১
শান্তির পায়রা ওড়ে মক্কার আকাশে - ৫৫
ওগো প্রেমিক! ওগো প্রিয়তম! - ৫৯
এল রে এল আজ মধুর লগন! - ৬৩
একটি সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান - ৬৭
হেরার আলোয় জগৎ হলো উজালা - ৭১
নীরবে জ্বলে আলোর মশাল - ৭৭
প্রাণে প্রাণে পড়ল সাড়া - ৮২
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই - ৮৫
চির উন্নত মম শির! - ৮৮
রক্তে ওই ভাসে দেখ আরবের বুক - ৯২
হাবশার অতিথি - ৯৭
অবরোধের ভেতর নবীজির দিনকাল - ১০৪
বিদায় হে বটবৃক্ষ - ১০৯
কেমনে সইব বলো বিরহ তোমার - ১১২
তায়েফের খুনরাঙা পথে - ১১৪
সে এক স্বপ্নের রাত - ১১৯
ছেড়ে যেতে হবে পিতৃভূমি - ১২৩
নতুন পৃথিবীর উদ্বোধন - ১৩০
তাঁর ছোঁয়াতেই বদলে গেল সব - ১৩৮
পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান - ১৪০
মুক্তির নতুন ইশতেহার - ১৪২
বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা - ১৫২
ও আমার দেশের মাটি - ১৬২
ঐ বিজয়ের কেতন ওড়ে - ১৭১
যেই কথা গেঁথে থাকে বুকেরও ভেতর - ১৭৭
নক্ষত্রের মহাপ্রয়াণ - ১৮১

একটি হাতি ও জাদুর পাখিরা

সারা মক্কায় একটা শোরগোল পড়ে গেল। সে কী চিৎকার চেঁচামেচি! উট-দুম্বা-বকরি- যার যা পাচ্ছে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে নিচ্ছে লোকগুলো।

ইয়া বড়ো মোচ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোঁকড়ানো চুল—সে কী বিচ্ছিরি চেহারা! দেখলে গা একেবারে শিরশিরিয়ে ওঠে।

মক্কার সবচেয়ে সম্মানী নেতা আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। ওমা! তোমরা চেন না তাকে? আচ্ছা বলছি শোন, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবীজির দাদুমণি। যে সময়ের কথা বলছি তখন কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেননি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের মাস দেড়-দুই আগের এক মজার ঘটনাই শোনাচ্ছি তোমাদের।

সেই যে বড়ো বড়ো মোচ আর খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকগুলো, যাদের কথা বলছিলাম তোমাদের! ওরা করল কি জান! আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদুমণি আবদুল মুত্তালিবের দু'শ উট একেবারে জোর করে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হয়তো কারও গাধাটা গাছের ছায়ায় একটু ঝিমুচ্ছিল, কি কারও বকরি দল বেঁধে ঘাস খাচ্ছিল। ওই লম্বা মোচ পাকানো শয়তানগুলো সামনে যা পেল, সবকিছু একেবারে লুট করে নিয়ে গেল!

ভাবছ, যাদের মালপত্তর লুট করে নিয়ে গেল তারা বাধা দিল না কেনো, এই তো? আরে, বাধা দেবে কীভাবে বলো, ওই শয়তানগুলোর হাতে ছিল ইয়া বড়ো বড়ো ছোরা-তরবারি, সাথে ছিল তির-ধনুক। সুতরাং বুঝতেই পারছ, আবদুল মুত্তালিবের লোকেরা কেনো বাধা দিতে গেল না!

তাই বলে আবদুল মুত্তালিব খুব ভীতু ছিলেন এমনটা ভেবে বসো না কিন্তু! আবদুল মুত্তালিব ছিলেন খুব সাহসী এবং বিচক্ষণ এক জন মানুষ। জানই তো বুদ্ধিমান মানুষেরা হুট করে কিছু করে বসে না। বুদ্ধিমান মানুষেরা যা করে খুব ভেবে-চিন্তে করে। আবদুল মুত্তালিব বুঝতে পেরেছিলেন—এই দস্যুগুলোর সাথে হুট-হাট ঝগড়া বাঁধিয়ে লাভ নেই, তারচেয়ে ভালো হবে ওদের সরদারের সাথে কথা বলে এর একটা বিহিত করা।

শয়তানগুলোর সরদার কে জান? জানার তো কথাই। শয়তানগুলোর সরদারটার নাম আবরাহা। এই আবরাহার কাজ হলো, অন্যায়ভাবে মানুষের জিনিস-পত্তর ছিনিয়ে নেওয়া। ইয়ামান নামে একটি দেশ আছে। দেশটির রাজাকে সরিয়ে আবরাহা একদিন সে দেশের রাজা সেজে বসে। জোর করে ক্ষমতা দখল করে রাজা হলে কী হবে, সে দেশের মানুষেরা কিন্তু মন থেকে আবরাহাকে মেনে নিতে পারেনি। প্রাণের ভয়ে উপরে উপরে সবাই আবরাহাকে রাজা মেনে নিল ঠিকই। তা না করে আর উপায় কী বলো! কে চায় খামোখা নিজের প্রাণটা চলে যাক? কেউ চায় না।

আবরাহা ছিল প্রচণ্ড অহংকারী। ভীষণ খারাপ মনের মানুষ। ইয়ামান দখল করেই সে ক্ষান্ত হয়নি; সে চাচ্ছিল পৃথিবীটা দখল করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে। একদিন সে দেখল, দল বেঁধে মানুষ মক্কা নগরীর দিকে যাত্রা করছে। ব্যাপারটা তখন সে অত গুরুত্ব দেয়নি; কিন্তু তার মনে কেমন কেমন একটা খটকা লাগে। সে ভাবে, লোকগুলো দল বেঁধে মক্কার দিকে যাচ্ছে কেনো? মক্কায় অমন কী কাজ তাদের?

এ কান ও কান ঘুরে একদিন ঠিকই কাবাঘরের সংবাদটা পৌঁছে যায় আবরাহার কানে। আবরাহা জানতে পারে, মক্কায় একটি ঘর আছে। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে। তারা সেই ঘর জিয়ারত করে যায়। সবাই ঘরটিকে বাইতুল্লাহ বা 'আল্লাহর ঘর' বলে সম্বোধন করে। বাইতুল্লাহর কথা জানতে পেরে আবরাহা তো আগুন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের কামার-কুমার, মিস্ত্রি-ইনজিনিয়ারদের ডেকে পাঠালেন রাজসভায়। হুকুম করলেন—কাবাঘরের চাইতে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় একটি ঘর বানাও এক্ষুনি!

কোথায় ইট, কোথায় বালি, কোথায় রড, কোথায় সিমেন্ট—দিনরাত কাজ চলতে থাকল আবরাহার আদেশে।

ঘর প্রস্তুত।

ঘোষিত হলো আবরাহার ফরমান—এখন থেকে কেউ কাবাঘরের উপাসনা করতে পারবে না! কেউ আর সেখানে যাবে না। এখন থেকে কেবল আবরাহার বানানো ঘরের উপাসনা চলবে!

আবরাহা ঘর বানিয়ে বসে বসে অপেক্ষা করে। দিন যায়। আরও কিছু দিন যায়। একজনও উপাসনা করতে আসে না আবরাহার ঘরে। আবরাহা তো মনে মনে ভীষণ ক্ষেপে ওঠে! এরই মধ্যে ঘটে যায় একটা মজার কাণ্ড! মক্কার বনু কেনানা গোত্রের একলোক চুপি চুপি একদিন আবরাহার বানানো ঘরে পায়খানা করে চলে যায়। আবরাহা যখন তার কাবায় ঢুকে এ দৃশ্য দেখতে পায় তখন তো সে রেগেমেগে একেবারে আগুন! পারলে রাগে নিজের মাথার চুল সব ছিঁড়ে ফেলে। তখন যদি তোমরা আবরাহাকে দেখতে—হেসে একেবারে কুটিকুটি হয়ে যেতে! সে কী তার রাগ! উজির-নাজির সব এক কর। সৈন্য-সামন্ত ডাকো! হাতিশালা থেকে হাতি বের কর। একেবারে যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা তখন আবরাহার।

বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে আবরাহা। রাগে চোয়াল দুটো ফুলে উঠছে তার। যে-করে হোক বাইতুল্লাহ মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে! একেবারে কঠিন প্রতিজ্ঞা তার!

আল্লাহর ঘর মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে আবরাহা! শুনে তোমাদের মনটা ভেঙে গেছে—তাই না? আরে এত তাড়াতাড়ি মন ভেঙো না! সামনে পড়ে দেখো না কী হয়!

শহরে ঢুকেই আবরাহার দুষ্টু লোকগুলো কী করল তা তো শুনেছই। ও-মা এখনই ভুলে গেলে! একটু আগেই না বললাম তোমাদের! ওই যে, উট-বকরি- যার যা পেল সব লুট করে নিয়ে গেল! এর মধ্যে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদুমণি আবদুল মুত্তালিবের দুশ উটও ছিল।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী মানুষ। তিনি করলেন কি জান? একেবারে সোজা আবরাহার রাজসভায় গিয়ে মুখের উপর বলে

বসলেন, আমার উট দুশ ফেরত দাও! তোমার লোকেরা আমার উটগুলো নিয়ে এসেছে। আমি আমার উট ফেরত চাই!

আবদুল মুত্তালিবের কথা শুনে আবরাহা একেবারে থ! বলে কী এই লোক! কোথায় সে তার উপাসনালয়—কাবার নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে, তা না করে সে এসেছে সামান্য কটা উট ফেরত চাইতে!

অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই আবরাহা বলে, ভেবেছিলাম তুমি খুব বিচক্ষণ মানুষ। এখন দেখছি তুমি আস্ত একটা গাধা! কোথায় কাবার নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে, তা না করে তুমি কি-না আমার কাছে উট চাইতে এসেছ! হায় নির্বোধ!

আবরাহাকে আরও বেশি হতাশ করে দিয়ে কণ্ঠ আরও শক্ত করে, মেজাজ আরও চড়া করে আবদুল মুত্তালিব বললেন—'দেখুন, আমি আমার উট ফেরত চাইতে এসেছি। উটগুলোর মালিক আমি। আমার মাল আমাকে ফেরত দিন! কাবার কথা বলছেন? কাবার মালিক তো আমি না। কাবার একজন মালিক আছেন। তিনিই তার ঘর শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবেন।'

দেখলে তো আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা কত্ত সাহসী মানুষ ছিলেন! একেবারে শয়তান সরদারের মুখের উপর থু থু মেরে এলেন! বুঝ তা হলে—দাদা এত্ত সাহসী হলে নাতি কত্ত বড়ো সাহসী হবে! হুঁ!

মক্কার আকাশে এখনো ঘন অন্ধকার। তার চাইতে বেশি ঘন মেঘে ঢেকে পড়েছে মক্কাবাসীর মনের আকাশ।

ভয়!

উত্তেজনা!

উৎকণ্ঠা!

গোত্রপ্রধান আবদুল মুত্তালিবের পরামর্শে পাহাড়ের উপত্যকায় আশ্রয়শিবির গড়ে তুলেছে মক্কাবাসীরা। মক্কার উপর, আল্লাহর ঘর কাবার উপর আক্রমণ চালাতে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মক্কার দিকেই এগিয়ে আসছে দস্যু আবরাহা বাহিনী। শেষবারের মতো কাবাঘরের দরোজা ধরে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন আবদুল মুত্তালিব। অশ্রুসজল

নয়নে দু'হাত এক করে বললেন, প্রভু ওগো, আমরা দুর্বল, শক্তিহীন, একমাত্র তুমিই পার শয়তানের হাত থেকে তোমার কাবাকে রক্ষা করতে। সাহায্য কর প্রভু! সাহায্য কর!

আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেন না। মুমিন বান্দার চাওয়া আল্লাহ কখনো অপূর্ণ রাখেন না। আবদুল মুত্তালিবের দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন, তা কি হয়? কখনো না! আল্লাহ করলেন কি দেখো না! সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আবরাহা তার বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে কাবার খুব কাছাকাছি চলে এল। তার সৈন্যবহরে কত কত সৈন্য! একেকজনকে দেখতে সে কী ভয়ঙ্কর! তার উপর ইয়া বড়ো বড়ো হাতিও আছে। আবরাহা নিজে বড়ো একটা হাতির উপর চড়ে বসেছে।

এক পা দু'পা করে আবরাহার হাতি এগিয়ে আসছে কাবাঘর লক্ষ করে। আরেকটু। আরও একটু। আর অল্প কিছু পথ পার হলেই কাবার কাছাকাছি চলে আসা যাবে। ধ্বংস করে দেওয়া যাবে কাবা। তোমরা কী ভাবছ? আবরাহা সত্যি সত্যি এবার আল্লাহর ঘর কাবা ধ্বংস করে ফেলবে? ধুর বোকা! জান না, আল্লাহ সর্বশক্তিমান! আল্লাহর শক্তির কাছে অন্যকোনো শক্তির কি তুলনা হতে পারে? পারে না। আল্লাহ করলেন কী দেখো! আবরাহা যখন কাবার দিকে তার হাতিকে চলতে বলে, অমনি হাতিটা বসে পড়ে। এক পা-ও এগুতে পারে না সামনের দিকে। আর যখনই অন্যদিকে মুখ করে, অমনি হাতিটা দিব্যি চলা শুরু করে! আল্লাহর কী কারিশমা তাই না?

হাতির এ আচরণ দেখে তো আবরাহার সে কী রাগ! হাতিকে এত পেটানো হয়; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। হাতি এক পা-ও কাবার দিকে এগুতে পারে না। এরই মধ্যে হলো কী দেখো—আল্লাহ সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন মক্কার আকাশে। কালো কালো পাখি। ছোটো ছোটো। একেবারে ছোটো। পাখিগুলো আবরাহা বাহিনীর মাথার উপর এসেই গুলির মতো ছোটো ছোটো পাথরকণা ফেলা শুরু করে। পাথর যার উপর পড়ে সেই একেবারে ভর্তা হয়ে যায়! আবরাহা চেয়েছিল পালিয়ে বেঁচে যাবে। কিন্তু বড়ো শয়তানটাকে শাস্তি না দিলে কি হয়? উঁহু! আল্লাহ আবরাহাকেও সেই পাথরের আঘাতে একেবারে ধ্বংস করে

দিলেন। কাবাকে ধ্বংস করতে এসে সে নিজেই কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ এভাবেই আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদুমণি আবদুল মুত্তালিবের দোয়া কবুল করেছিলেন। তোমরা কুরআন শরিফে সুরা ফিলের মধ্যে সেসব কাহিনি জানতে পারবে। সুযোগ করে পড়ে নিয়ো—কেমন?

মা আমেনার কোলে হাসে পূর্ণিমারই চাঁদ

সুবহে সাদিক। মক্কার আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি চলছে। অনেকে এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহর খুব কাছাকাছি প্রায় পরিত্যক্ত জীর্ণ এক কুটির। একজন মহীয়সী নারী মাত্রই সন্তান প্রসব করেছেন। জীর্ণ কুটিরের থোকা থোকা অন্ধকারের ভেতর এ যেন নতুন চাঁদের হঠাৎ আগমন।

চাঁদ!

নাহ, চাঁদ বললেও ঠিক ভুল হবে। চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল সুন্দর সে মুখ! ভুবন জুড়ানো হাসি সেই মুখে। চোখের তারায় যেন দ্যুতি ছড়ায়। আচ্ছা, তোমরা জান, কে এই নতুন অতিথি?

হুম... বুঝতে পেরেছ, তাই তো?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ—আকাশ-পৃথিবী আলোকিত করে মক্কার জীর্ণ কুটিরে আজ যে শিশু জন্ম নিলেন, তিনিই আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মা আমেনার কোল আলোকিত করে সুবহে সাদিকের সময় পৃথিবীতে আগমন করলেন আমাদের প্রাণের নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কী চমৎকার সেই মুহূর্তটি! অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীর বুকে আলোর ফোয়ারা নিয়ে—মানবতার মুক্তির দূত হয়ে—মা আমেনার ছোট্ট কুটিরে, এক টুকরো নতুন চাঁদের মতোই আগমন করলেন আমাদের সবার প্রিয় মানুষ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ! আহা—কী সুখ সুখ লাগা সেই ভোর!

যখন কোনো মা সন্তান প্রসব করেন তখন তার কী যে কষ্ট হয়, তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। সন্তান প্রসবের সময় একজন মা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কষ্টটা অনুভব করেন। সহ্য করেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য জান! আমাদের প্রিয়নবীর জন্মের সময় মা আমেনা সামান্য কষ্টও অনুভব করেননি। কী আশ্চর্য তাই না? আরে, যিনি

পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি কি কাউকে কষ্ট দিতে পারেন? পারেন না! তা হলে মা আমেনার কেনো কষ্ট হবে? আল্লাহ মা আমেনার প্রসবকালীন সমস্ত কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। কারণ, আমেনা—তিনি যে আমাদের প্রিয়নবীর মা! তিনি যে ভাগ্যবতী!

স্বপ্নে আসে রাজপুত্র

জীবনসঙ্গী, স্বপ্নপুরুষ, প্রাণপ্রিয় স্বামী আবদুল্লাহ ইনতেকাল করেছেন ছয় মাস হতে চলল। এ ছয় মাসেও স্বামীর স্মৃতি ভুলতে পারেন না আমেনা। কীভাবে ভুলবেন তিনি? প্রেম কি ভোলা যায়? তারপরও স্বাভাবিক হতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান আমেনা। তার যে স্বাভাবিক হতেই হবে! নিজের জন্য না হোক—নিজের ভেতর যাকে এতটা মাস বহন করে চলেছেন। প্রাণপ্রিয় স্বামীর আমানত, শেষ এবং একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন কী করে এড়িয়ে যাবেন তিনি? সব কষ্ট ভুলে তাই স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেন। দিন গিয়ে রাত আসে। রাত গিয়ে দিন ফুরায়। আমেনা নতুন অতিথির অপেক্ষায় প্রহর গুনেন।

রাতে ঠিকঠাক ঘুম হয় না আমেনার। প্রায় দিনই মধ্যরাতে ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠেন। উঠেই পেটের উপর হাত বুলিয়ে একটা তৃপ্তির হাসি হাসেন। তারপর স্বপ্নের কথা ভেবে চিন্তায় চিন্তায় রাত পার করেন। ভেবে পান না—কী ব্যাখ্যা হতে পারে এমন স্বপ্নের? কী বিস্ময়কর সে স্বপ্ন! মা আমেনা স্বপ্নের কথা ভেবে ভেবে কূল হারান। শুনতে চাও কী এমন স্বপ্ন দেখে দেখে মা আমেনার ঘুম ভেঙে যেত? শুনলে তোমরা অবাক না হয়ে পারবে না। একদিনের কথাই শোন না—ঘুটঘুটে অন্ধকার মক্কার আকাশে। তার চাইতে বেশি অন্ধকার মা আমেনার জীর্ণ কুটিরে। হঠাৎ মা আমেনা স্বপ্নে দেখেন, তার ঘরের ভেতর আলোর একটা ঝলকানি খেলে গেল। কী তীব্রতা সে আলোয়। মা আমেনার মনে হচ্ছিল আলোটা তার ভেতর থেকেই যেন হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে আলোটা আরও প্রখর হয়ে চারপাশ জাপটে ধরল! সে আলোর ঝলকানিতে মা আমেনার চোখ জ্বালা করে ওঠে। মা আমেনার অন্তর-দৃষ্টি কি খুলে গেল? তিনি দেখতে পাচ্ছেন। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন বুসরার রাজ-প্রাসাদগুলো। ওই তো, প্রাসাদের ছোটো তোরণটা পর্যন্তও দিবালোকের ন্যায় ভেসে উঠছে

মা আমেনার চোখের কোণে। শুধু কি এই-ই? উঁহু, মা আমেনার চোখের সামনে পূর্ব-পশ্চিমের সবকিছু একেবারে ছবির মতো ফুটে উঠছে! আহা এ যেন রূপকথার রূপের জাদু! এরপর কী হলো জান? হঠাৎ অদৃশ্য হতে একটা মোলায়েম কণ্ঠস্বর ভেসে এল! কী মায়া ছড়ানো সে কণ্ঠে! যেন জাদুমাখানো! মা আমেনা সুবোধ বালিকার মতো তন্ময় হয়ে শোনেন সে কণ্ঠস্বর। অনেকটা আদেশের মতোই শোনায় সে আওয়াজ—আমেনা, তোমার গর্ভের এ সন্তানের নাম আহমদ রাখবে! শোন, সে হবে বিশ্বজগতের সরদার—মনে রেখো!

এ কী আদেশ নাকি অনুরোধ? অদৃশ্য সেই কণ্ঠস্বরে মা আমেনার মনে একটা স্বর্গীয় সুখ উঁকি মেরে ওঠে। রাজপুত্রের মা হতে চলেছেন তিনি! স্বপ্নের ভেতরই আরেকবার নিজের পেটের উপর হাত বুলান। ভবিষ্যৎ রাজপুত্রের মাথায় এ যেন স্নেহময়ী মায়ের ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দেওয়া।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

আর দশটা সকালের মতো নয় আজ। আজকের সকালটা একটু অন্যরকম। সূর্যটা এইমাত্র তার কর্মব্যস্ততা শুরু করতে বসেছে। কেমন ঝকঝকে আর তকতকে সূর্যের রঙ! যেন গোলাবের জলে ধুয়ে এসেছে নিজের শরীর। বাইতুল্লাহর আঙিনা থেকে তাকালে সামনেই যে খেজুর গাছের সারিটা দেখা যাচ্ছে, সেগুলোতেও আজ কেমন যেন একটা চনমনে ভাব! মরুভূমির দেশ হওয়ায় এমনিতেই মক্কার আকাশ সবসময় ফুটন্ত কড়াইয়ের মতো রেগে থাকে, তার উপর এখন আবার চলছে এপ্রিল মাস—বুঝ তা হলে অবস্থাটা! কী সকাল আর কী রাত; গরমে সবাই কুপোকাত! কিন্তু কী আশ্চর্য দেখো—আজকের সকালটা একেবারে ভিন্ন! প্রকৃতির মনে যেন আজ বসন্তের রঙ লেগেছে!

এত সকাল সকাল মক্কার লোকেদের ঘুম ভাঙে না সহজে। যারা ভালো মনের মানুষ তারা সকাল সকাল উঠে বাইতুল্লাহয় গিয়ে উপাসনা করে। আমাদের নবীজির প্রিয় দাদুমণি আবদুল মুত্তালিবকে তো চেনই। তিনি ছিলেন তেমনি ভালো মানুষদের একজন। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে শিষ্য-শাগরেদ, গোত্রের লোকেদের নিয়ে কাবার চত্বরে বসে

জ্ঞানগর্ব আলোচনা করেন। প্রতিদিনকার মতো আজও তিনি কাবা-চত্বরে বসে আলোচনা করছিলেন। প্রকৃতির সাজ সাজ রব তার চোখেও বেশ ভালোভাবেই ধরা পড়েছে। তিনিও ভাবছিলেন, মক্কার উগ্র আকাশ আজ হঠাৎ এমনভাবে বদলে গেল—ব্যাপার কী!

সারি সারি খেজুর গাছ বাতাসে তির তির করে কাঁপছিল। তাদের কাঁপুনিতে কেমন যেন একটা আহ্লাদের ভাব ফুটে উঠেছিল। এসব কোনোকিছু চোখ এড়ায়নি দাদা আবদুল মুত্তালিবের। তিনি ভাবছিলেন। এমন সময়ই একজন এসে খবরটা দিয়ে গেল তাকে। বসা থেকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। দৌড়ে চলে গেলেন বৌমা আমেনার ঘরে। মজমা ছেড়ে আবদুল মুত্তালিবের হঠাৎ এমন প্রস্থানে সবাই হতভম্ব! কী হলো! নতুন কোনো দুঃসংবাদ নয় তো? মাস তিন পার হয়নি মক্কার উপর শয়তান আবরাহার কুনজর পড়েছে। আল্লাহ অবশ্য শয়তানটাকে উচিতশিক্ষা দিয়েছেন। মক্কার লোকেদের মনে তবু একটা ভয় কাজ করে, যদি নতুন করে আবার কোনো শয়তানের চোখ পড়ে কাবার উপর! ভীত ভীত চোখে আবদুল মুত্তালিবের চলে যাওয়া দেখছিলেন সবাই। দেখলেন, কাবা-চত্বর পার হয়েই আবদুল মুত্তালিব সোজা পুত্রবধূ আমেনার ঘরে প্রবেশ করলেন।

তারপর?

তারপর?

আহা সে দৃশ্য যদি তোমরা দেখতে! আবদুল মুত্তালিবের সে কী আনন্দ! আজ যে তার সবচেয়ে খুশির দিন। আজ যে তার কেবলই আনন্দের দিন। তার প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহর ঘরে যে আজ আকাশের চাঁদ নেমেছে!

আবদুল মুত্তালিব ঘরে ঢুকতেই মা আমেনা শিশুনবী মুহাম্মাদকে দাদার কোলে তুলে দেন। মাথায় ঘোমটা টেনে বলেন, 'আব্বাজান, এই নিন আপনার আহমাদ!'

আবদুল মুত্তালিব প্রাণপ্রিয় নাতিকে কোলে নিয়ে কপালে চুমু খান। চোখে চুমু খান। গালে চুমু খান। তার যেন আনন্দ আর ধরে না! নাতিকে আদর করতে করতে বলেন, 'আমেনা, মা আমার! আমার কলিজার টুকরোর নাম কি আহমাদই ঠিক করেছ?'

আমেনা ভাঙা ভাঙা শব্দে বলেন, 'আব্বাজান, আপনার নাতি যখন গর্ভে তখন এ নামটি রাখার ব্যাপারে আমি সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। এ নামটিই রাখতে চাই আমি!'

আবদুল মুত্তালিব বলেন, 'আহমাদের সাথে তবে মুহাম্মাদও থাকুক না! কী বলো তুমি?'

মুহাম্মাদ—আহা! পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি সে নাম! কী মধুর নাম! কত জাদুমাখা! তাই না?

মা আমেনার ঘর থেকে বের হয়ে নাতি মুহাম্মাদকে নিয়ে আবদুল মুত্তালিব কাবাঘরে ঢুকে পড়লেন। সবাই চেয়ে দেখল, আবদুল মুত্তালিব একটি চাঁদের টুকরো কোলে করে কাবার দরজা ধরে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন। দোয়া শেষ হলে কাবার চত্বরে দাঁড়িয়েই উল্লাস করে উঠলেন—এ্যাই! এ্যাই! আরে কে কোথায় আছিস! দেখ তোরা আমার কলিজা, আমার চোখের মণি—এই যে দেখ, আমার আবদুল্লাহ! আরে গেলি কোথায় সব? আজ যে খুশির দিন! তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

শিশুনবী দোলনা দোলে
মা হালিমার কোলে

তায়েফ নগরীর নাম শুনেছ কখনো? সে এক চমৎকার সুন্দর নগরী! গাছে গাছে ফুল। ডালে ডালে পাখি। সকাল সন্ধ্যা পাখিদের ডাকে মুখরিত চারপাশ। আর—আহা ফুলের সে কী ঘ্রাণ! এই তায়েফ নগরীতেই বাস করতেন এক জন পুণ্যবতী নারী। হালিমা তার নাম। তিনি ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত বংশ বনু সাদ গোত্রীয়। এক ছেলে তিন মেয়ে আর স্বামী নিয়ে বড়ো অভাবের সংসার তার। একবেলা খাবার জোটে তো আরেকবেলা উপোস থাকে। ভীষণ টানাটানির সংসার।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন কিছুদিন হলো। সেই যে আবরাহাকে যে বছর আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন, সে বছরের ঘটনা। তায়েফের মতো সবুজ শ্যামল নগরীটা মুহূর্তেই ছাইয়ের মতো ঝাপসা হয়ে গেল। অনাবৃষ্টি আর খরায় মাটি ফেটে চৌচির। খাবার নেই। পানি নেই। সে কী কষ্টের জীবন! এই কষ্টের বাতাস সাদ গোত্রের হালিমার গায়েও এসে লাগল। সন্তানদের নিয়ে গুনে গুনে দিন পার করেন তিনি।

একদিন। হালিমা দেখলেন বেশ বড়ো একটি কাফেলা মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেছে। প্রতি বছরই এ রকম একটা দুইটা কাফেলা মক্কা অভিমুখে বের হয়। মক্কা থেকে চুক্তিতে বাচ্চা এনে বড়ো করে তোলে। এতে করে কিছু অর্থকড়ির ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

মক্কা অভিমুখে কাফেলা যেতে দেখে হালিমার ভেতরটা নড়ে উঠল! একটা অস্থিরতা বাসা বাঁধতে শুরু করল হালিমার মনে। হালিমা দৌড়ে ঘরে ঢুকল। স্বামীকে কাফেলার সংবাদ জানিয়ে সফরের আগ্রহের কথাও বলল। অভাবের সংসার। হালিমার কথায় আর না করার যুক্তি দেখাল না হারিস। হারিস ছিলেন হালিমার স্বামী।

ধু-ধু মরুভূমি। মাথার উপর আকাশের ছাদ। এককোণে পূর্ণিমার চাঁদ। নির্জন মরুভূমির বুক চিরে কাফেলা চলছে মক্কার উদ্দেশে। কাফেলার একেবারে পেছনে হালিমার সাদা রঙের গাধাটা। সাদা একটা গাধায় চড়ে মা হালিমা কাফেলার পেছন পেছন যাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন স্বামী হারিসও। হালিমার কোলের ছোট্ট শিশুটা একনাগাড়ে কেঁদেই যাচ্ছে। কাফেলার অন্যরা বলাবলি করছে, হালিমা, কী হলো তোমার? এত ধীরে হাঁটছ কেনো? আহা! বাচ্চাটা একটু থামাও না!

কোলের শিশু আবদুল্লাহর কান্না কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না। না খেয়ে খেয়ে হালিমার বুকের দুধও শুকিয়ে গেছেপ্রায়। হারিস উষ্ট্রীর ওলানে হাত দিয়ে দেখে ওলানেও দুধ নেই। ওদিকে কেঁদেই চলছে হালিমার কোলের শিশু আবদুল্লাহ।

কাফেলা চলছে।

মুরুভূমির বুক চিড়ে লাল টকটকে সূর্যটা উঁকি দিতে শুরু করেছে। ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে হালিমা হারিসের কাছে গিয়ে পুত্র আবদুল্লাহকে তুলে দেন। চোখ ডলতে ডলতে বলেন, 'আবদুল্লাহকে দেখে রাখো। আমি দেখি কোনো বাচ্চা পাই কিনা। শুনছো, অনেকেই নাকি বাচ্চা পেয়ে গেছে! আমাদের কি জানি কী জোটে! তুমি থাক, আমি বেরুলাম।'

আচ্ছা, তোমরা কখনো মরুভূমি দেখেছ? সূর্যের রোদ লেগে মরুভূমির বালু কেমন তেজ ছড়ায়- দেখেছ কখনো?

দেখনি।

সূর্যের রোদ লেগে বালু কেমন চকচক করে ওঠে—দেখেছ কখনো?

দেখনি।

যদি দেখতে! উফ! আগুনের মতো ভয়ঙ্কর সে বালু! খালি পায়ে তো দূরের কথা, জুতা পরেও হাঁটা অসম্ভবপ্রায়—এমনি গরম সে বালু!

হালিমা শিশু বাচ্চা খুঁজতে খুঁজতে পায়ে ফোঁসকা বানিয়ে ফেলেছেন। এতক্ষণ হয়ে গেল একটা বাচ্চা এখন পর্যন্ত পেলেন না তিনি। রোগা-পাতলা বলে কেউ তাকে বাচ্চা দিতে চায় না। অথচ, অন্যরা সবাই পছন্দমতো বাচ্চা পেয়ে গেছে। বেছে বেছে ধনীর দুলাল-দুলালিদের নিয়ে

নিয়েছে সবাই। কিন্তু হালিমা! সেই যে কখন থেকে এদিক-সেদিক, এর কাছে ওর কাছে যাচ্ছেন; কিন্তু কেউ তাকে বাচ্চা দত্তক দিচ্ছে না।

তবে কি খালিহাতেই ফিরে যেতে হবে?

দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি কী দিয়ে ঘুচাবেন তিনি?

কিছু অর্থকড়ির ব্যবস্থা না হলে সংসার চলবে কেমন করে?

অর্থ!

অর্থের যে এখন বড়ো প্রয়োজন মা হালিমার। কোনো শিশু দত্তক না পেলে সেই অর্থের দেখা মিলবে কী করে? না, খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে না। যে করেই হোক একটা বাচ্চা তাকে যোগাতেই হবে।

দূরে, মাঠের এক কোণে এক জন বৃদ্ধকে দেখা যাচ্ছে। হাঁপিয়ে উঠেছেন বুড়ো। বাচ্চা দত্তক-নিতে-আসা কয়েকজনের সাথে কথা বলতেও দেখা যাচ্ছে তাকে। তার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। হতাশা! হয়তো দর কষাকষিতে বনাতে পারছেন না বুড়ো। হালিমা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছেন বুড়োকে। এদিকে হালিমার ভাগ্যেও কোনো বাচ্চা জুটছে না। হালিমা ভাবলেন, বুড়োর সাথে কথা বলে দেখা যাক—হয়তো বাচ্চা একটা মিললেও মিলতে পারে। তা ছাড়া বুড়োর চেহারায় আভিজাত্যের একটা ছাপ আছে।

সাত-পাঁচ না ভেবে হালিমা সোজা বুড়োর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু নাহ, বাচ্চার বাবা বেঁচে নেই। মা আর দাদা মিলে কী-ইবা সম্মানী দেবে? বুড়োর সাথে কথা বলে হালিমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল—এতিম বাচ্চা নিয়ে কীভাবে সংসার চলবে!

দুপুরের কড়া রোদ। সূর্যের তাপে বালু চিকচিক করছে। কলজে ফাটা গরমের ভেতর মরুভূমির একপাশে দাঁড়িয়ে বুড়ো লোকটি কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মা হালিমার সাথে কথা বলছেন। বুড়োর সে কণ্ঠে ঝরে পড়ছে অনুরোধের ঝরনাধারা। মা, নেবে তুমি আমার নাতিকে? নাও না! আমার মন বলছে—তোমার কাছে ও অনেক ভালো থাকবে। না—না, পাওনা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তোমার পাওনা ঠিকঠাক পেয়ে যাবে। নেবে মা?

হালিমা বুঝতে পারছেন না ঠিক কী জবাব দেবেন বুড়োকে। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই এতিম বাচ্চা ছাড়া তো কোনো বাচ্চাও পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে। আমি আগে আমার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নিই।

স্বামী হারিসের সাথে পরামর্শ করে দ্রুতই ফিরে এলেন হালিমা। বললেন, ঠিক আছে আপনার এই এতিম নাতিটিকে আমি নিয়ে নিলাম। যথাসময়ে আপনাকে ফেরত দিয়ে যাব।

তোমরা বলতে পার এই এতিম বাচ্চাটি কে ছিলেন? দুপুরের কড়া রোদে পুড়ে মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দত্তক খুঁজছেন কে? বলতে পারবে এই বুড়ো লোকটিইবা কে ছিলেন? হ্যাঁ, এই এতিম বাচ্চাটি ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বুড়ো লোকটি ছিলেন প্রিয় দাদুমণি আবদুল মুত্তালিব। সেদিনকার বনু সাদ গোত্রের হালিমাই হলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমা।

হালিমা!

মা হালিমা!

আহা! সে কী এক ভাগ্যবতী মায়ের নাম!

এ যেন এক জাদুরকাঠি!

জাদুরকাঠি দেখেছ কখনো? সেই কাঠির ছোঁয়া লাগলে কাগজের ফুলও ঘ্রাণ ছড়ায়—দেখেছ কখনো এমন কোনো জাদুর কাঠি? হ্যাঁ, সে এক জাদুরকাঠির গল্পই শোনাচ্ছি তোমাদের। আচ্ছা, এমন একটা জাদুরকাঠি যদি তোমাদের কাছে থাকত, কেমন লাগত তোমাদের? নিজেকে পৃথিবীর রাজা মনে হতো—তাই না? আহা! সে কী গৌরবের ঘটনাই না ঘটিয়ে ফেলতে বন্ধুদের মাঝে!

আচ্ছা, ধরো সেই জাদুরকাঠিটা তুমি পেলে না। তোমার এক বন্ধু পেল। পেয়ে তার ভাগ্য রীতিমতো বদলে গেল! কী, খুব হিংসে হচ্ছে? হিংসে তো হওয়ারই কথা—তাই না? ঠিক এমন এক জাদুরকাঠি পেয়েছিলেন ভাগ্যবতী এক মহিলা! সে অনেক আগের কথা। লু হাওয়া, মরুভূমির তপ্ত বালুকাময় পথ পাড়ি দিয়ে মহিলাটি এসেছিলেন মক্কায়।

এসেছিলেন সুদূর তায়েফ থেকে। সাথে বান্ধবীরাও অনেকে এসেছিল; কিন্তু কী কপাল দেখ—সেই জাদুরকাঠিটা তার ভাগ্যেই জুটল এসে! তাই তো তিনি ভাগ্যবতী। তাই তো সবাই তাকে ভাগ্যবতী হালিমা সাদিয়া বলে ডাকে!

সেই জাদুরকাঠির সুন্দর নামটি শুনবে না? কী মধুর সে নাম! যেমন জাদুরকাঠি তেমনি তার জাদুময়ী নাম—মুহাম্মাদ!

হ্যাঁ, সেই জাদুরকাঠি হলেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মা হালিমা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দত্তক নেওয়ার সাথে সাথেই তার কপাল খুলে গেল! তার বুকে দুধ ছিলই না বলতে গেলে। কিন্তু যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ লাগে, অমনি তা দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাথে তার দুধভাই আবদুল্লাহ তৃপ্তির সাথে দুধ পান করলেন।

শুধু কি তাই? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দত্তক নেওয়ার জন্য তায়েফ থেকে যে গাধার উপর চড়ে হালিমা মক্কা এসেছিলেন, সেই গাধা এতই দুর্বল ছিল যে, সঙ্গীরা হালিমার সাথে চলতে গিয়ে রীতিমতো বিরক্তই হচ্ছিল! মরুভূমির বালুকাময় পথ পাড়ি দিতে গিয়ে গাধাটি দৌড়ে চলবে তো দূরের কথা হাঁটতেই পারে না ঠিকমতো। অথচ দেখ, জাদুরকাঠি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়ে মক্কা থেকে ফিরতে গিয়ে যেই-না গাধাটির উপর চড়ে বসেছে, অমনি গাধাটি সবাইকে পেছনে ফেলে, ধুলো উড়িয়ে, একেবারে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। সঙ্গীরা তো অবাক—'ও হালিমা, আরে একটু আস্তে চলো না রে বাবা! আমরা তো পেছনে পড়ে যাচ্ছি! সত্যি করে বলো তো, এটা কি তোমার আগের সেই দুর্বল-রোগা গাধীটাই? উঁহু, মনে হচ্ছে না!'

আরে একটু আস্তে চলো না ভাই—আমরা তো হাঁপিয়ে উঠলাম!

দেখলে তো জাদুরকাঠির সে কী কারিশমা!

হালিমা সাদিয়ার তখন খুব অভাব। তিনটা সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছিল তাকে। তার উপর আবার দত্তক এনেছেন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। পড়শিরা অনেকেই বলাবলি করছিল—নিজের সন্তান মানুষ করতেই জান যায়, আবার উনি এসেছেন অন্যের ছেলে পালবেন! হুঁহ, ঢঙে আর বাঁচি না বাবা!

হালিমা কারও কথা গায়ে মাখেন না। কারণ, তিনি এরই মধ্যে জেনে গেছেন কী এক জাদুরকাঠি পেয়েছেন। পড়শিদের গা-জ্বলা দেখে মা হালিমা মুচকি হাসেন শুধু।

একবারের ঘটনা শোন—হালিমার কিছু বকরি ছিল। পড়শিদেরও বকরি ছিল। প্রতিদিন সবার বকরি মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যেত রাখালেরা। সন্ধ্যায় যখন বকরিগুলো ফিরে আসত, দেখা যেত মা হালিমার বকরিগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে পেট ফুলিয়ে আসত আর অন্যদের বকরিগুলো একটাও ঘাস পেত না খাওয়ার জন্য। তখন পড়শিরা তাদের রাখালদের বকাঝকা করত। বলত, অই, তোরা করিস কী শুনি! হালিমার বকরিগুলো যেখানে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যায় তোরাও সেখানে তোদের বকরিগুলো নিয়ে যেতে পারিস না! গাধার দল!

পরদিন পড়শিদের রাখালেরা হালিমার বকরির সাথে তাদের বকরিগুলো ছেড়ে দিত; কিন্তু কী মজার ব্যাপার দেখ, সন্ধ্যায় যখন বকরিগুলো ফিরে আসত, দেখা যেত সেই হালিমার বকরিগুলোই খেয়ে একেবারে পেট ফুলিয়ে ফেলেছে। অন্যদের বকরিগুলো আগের মতো না খেয়ে একেবারে কাঠ। ওরা কি আর জানে যে, হালিমার কাছে জাদুরকাঠি আছে? জানে না!

ফিরিয়ে দিতে হবে জাদুরকাঠি

মাস গিয়ে বছর যায়। এক বছর। দুই বছর। ততদিনে জাদুরকাঠির ছোঁয়ায় বদলে গেছে মা হালিমার জীবন। তার জীর্ণ কুটিরে এখন ভরা জোছনা। গভীর অন্ধকারে আলো খুঁজে পাওয়ার মতোই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন তিনি। এই দুইটা বছর স্বপ্নের মতোই কেটেছে মা হালিমার। কিন্তু, কিন্তু নিয়মমতো দুই বছর পর এখন, এই এখনই যে রাসুলুল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে হবে মায়ের কোলে। রাসুলুল্লাহকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা মনে হলেই বিষাদে ছেঁয়ে যায় মা হালিমার বুক।

এমন জাদুর পরশ আর কোথায় পাবেন মা হালিমা? পৃথিবীর কোথাও কি পাওয়া যাবে এমন জাদুরকাঠি? কক্ষনো না!

কিন্তু তিনি কি তার ওয়াদার কথা ভুলতে পারেন?

না—কক্ষনো না!

তিনি যে নবীজির দুধমা!

তিনি যে আমাদের প্রিয় মা হালিমা!

প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মা হালিমা নবীজিকে তার মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিতে মক্কায় আসেন। কষ্টে বুকটা তার ফেটে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল আরও ক'টা দিন যদি জাদুরকাঠিখানা কাছে রাখতে পারতেন!

আল্লাহ মা হালিমার দিকে তাকিয়েছেন। ভাগ্য তার বড়ো সুপ্রসন্নই বটে। সেবার মক্কায় রোগ-বালাই ভরে গেল। কী বিচ্ছিরি রোগরে বাবা! আজ একে ধরে তো, কাল ওকে ধরে! মা হালিমা ভাবলেন, এ-ই সুযোগ; কাজে লাগাতে হবে। একদম কাজে লাগাতে হবে!

ওদিকে শিশু মুহাম্মাদকে পেয়ে মা আমেনার বুকে যেন খুশির জোয়ার নেমেছে। বুকের মানিক—সোনার চান—জানের জান—মুহাম্মাদকে কোলে নিয়ে তিনি যেন সুখের সাগরে ভেসে গেলেন।

রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা মা আমেনাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। তাই যখন হালিমা সুযোগ বুঝে মা আমেনার কাছে আবদার তুলল—বোন, শহরের এখন যে পরিস্থিতি এই অবস্থায় আমি চাচ্ছিলাম আপনার মুহাম্মাদকে আরও ক'টা দিন আমার কাছে রাখি। শহরের অবস্থা ভালো হলে না হয় আবার ওকে আপনার কোলে ফিরিয়ে দেব!

মা আমেনা দেখলেন প্রস্তাবটা মন্দ না। এই রোগ-বালাইয়ের মধ্যে না রেখে বুকের মানিককে আরও কিছুদিন হালিমার কাছে রাখাটাই উত্তম কাজ হবে।

মা হালিমার আনন্দ আজ কে দেখে!

জাদুরকাঠি—চোখের মণি—মুহাম্মাদকে বুকে নিয়ে মা হালিমা আকাশের দিকে চেয়ে একটা তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

আহা! আজ যে তার আনন্দের দিন!

মরুভূমিতে মরুর দুলাল

দুই বছর বয়সের শিশু মুহাম্মাদ। বয়স দুই বছর হলে কী হবে—জ্ঞানে-গুণে পনেরো বছর বয়সের কিশোরকেও ছাড়িয়ে গেছেন ইতোমধ্যে। দুধভাইয়ের সাথে মাঠে খেলতে যান। বকরি চরান। দুই বছর বয়সের বাচ্চারা মাকে কেমন জ্বালাতন করে দেখেছ না? কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা হালিমাকে একটুও জ্বালাতন করতেন না। হালিমার তিন মেয়ে এক ছেলের মধ্যে শায়মা নামে এক মেয়ে ছিল। ধরো—তখন তার বয়স আট কি নয় বছর। শিশুনবী মুহাম্মাদকে সে খুব বেশি ভালোবাসত। অনেক অনে—ক আদর করত। নবীজিকে কোলে নিয়ে চুমু খেতো। পিঠে নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলত। এ যেন মায়ের পেটের বড়ো বোন। মা হালিমার অন্য ছেলের সাথে নবীজিও মাঠে বকরি চরাতে যেতে চাইতেন। মা হালিমা প্রতিবারই থামিয়ে দিতেন। বলতেন—না, বাবা, তোমার মাঠে গিয়ে রোদে পুড়ে কাজ নেই। তোমার ভাইবোনেরাই সব কাজ সামলে নিতে পারবে।

কিন্তু শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন কিছুতেই কিছু মানে না। বাইরে যাওয়ার জন্য সারাক্ষণই মন তার ছটফট করে। মা হালিমাও শিশু মুহাম্মাদের ছটফটানি বোঝেন। তিনিও ভাবেন, দুধভাইদের সাথে মুহাম্মাদকে খোলা আকাশের নিচে উড়তে দেবেন। কিন্তু অজানা একটা আশঙ্কা তাকে আটকে রাখে—যদি মুহাম্মাদের কিছু হয়ে যায়! যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় শিশু মুহাম্মাদের! কী জবাব দেবেন মা আমেনার কাছে? মুহাম্মাদ যে তার আমানত!

একদিন দুধভাই আবদুল্লাহ এসে মায়ের কাছে বায়না ধরে বসল—'মুহাম্মাদকে আমার সাথে দাও না মা! দাও না! আমরা একসাথে খেলব। দুষ্টুমি করব।'

আবদুল্লাহ এমন করে বলল—মা হালিমা আর না করতে পারলেন না। শিশু মুহাম্মাদকে ছাড়লেন বটে; তবে আবদুল্লাহকে সতর্ক করে দিলেন—'দেখ, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। খুব সাবধানে থাকবে!'

মুক্ত আকাশের নিচে শিশুনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সারাদিন ভাইদের সাথে খেলেন। দুষ্টুমি করেন। মাঠে গিয়ে

মেষ চরান। মরুভূমির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়ান। পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়ে বসে থাকেন। বসে বসে কী যেন ভাবেন। কী অত ভাবেন শিশু মুহাম্মাদ?

বিশ্বজগতের কথা?

স্রষ্টার কথা?

কী অত ভাবনা ভাবেন শিশু মুহাম্মাদ?

দিন গিয়ে মাস যায়। শিশুনবী মুহাম্মাদকে চোখে চোখে, বুকে বুকে আগলে রাখেন মা হালিমা। একজন সত্যিকারের আরব বেদুইনের মতোই প্রচণ্ড সাহস বুকে বেড়ে ওঠেন শিশুনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অপারেশন ক্লিনহার্ট

পায়ে পায়ে বেড়ে উঠছেন শিশুনবী মুহাম্মাদ । সকাল হলে দুধভাইয়ের সাথে মেষ চরাতে মাঠে যান। রোদে পুড়ে ভাইয়ের সাথে কাজ করেন। বয়স আর কত হবে—তিন কি চার! অথচ শিশুনবীর কাজকর্ম দেখলে বলতেই পারবে না কেউ—এতটুকুন একটা ছেলে অত সব কাজ...! নাহ, কীভাবে সম্ভব?

যেদিন থেকে শিশুনবী মুহাম্মাদ দুধভাইয়ের সাথে ঘরের বাইরে যাওয়া শুরু করেছেন সেদিন থেকেই মা হালিমার বুকের ভেতর একটা দুশ্চিন্তা শেকড় গেড়ে বসেছে। দিনরাত তিনি মুহাম্মাদের চিন্তায় বিভোর থাকেন—যদি কিছু হয়ে যায় মুহাম্মাদের! তবে তার মায়ের কাছে কী জবাব দেবেন হালিমা? যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে যে বনি সাদ গোত্রের সুনাম সুখ্যাতি ধুলায় মিশে যাবে। না—না, মুহাম্মাদ যে তার আমানত!

অন্যদিনের চাইতে আজ একটু বেশিই চিন্তা হচ্ছে মা হালিমার। ভাইয়ের সাথে মুহাম্মাদ যখন ঘর থেকে বের হয়েছেন তখন থেকেই কেনো জানি মা হালিমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে বার বার!

মুহাম্মাদের কিছু হলো না তো!

ঠিক স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারছেন না মা হালিমা। বার বার উঁকি মেরে বাইরে তাকান—মুহাম্মাদ কি এল!